সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে ইবনে খালদুনের 'আসাবিয়া' মতবাদের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা

নিরূপা ভৌমিক[১] এবং ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম[২]

Abstract

Ibn Khaldun was a scholar of history, philosophy and politics and the best social scientist among those in his contemporary era. His social solidarity i.e. Asabiyah was the most important concept in developing the social harmony and philosophy of state. This concept helped developing the harmonious relationship among people during that time. Among the concepts having great contribution in building the society and state 'Asabiya' is considered as one of the powerful concepts having direct contribution. Society becomes stronger because of kinship that binds them together. The religious beliefs, nomrs, practices, customs strengthens bonding among the groups and creates harmony, particularly among the big groups. On the other hand, small groups become stronger for their survival. This is the process of 'Asabiya' that helps building the society. It still works in shaping and transforming the society and state. Different stages of formation of state identified by Ibn Khaldun dicate the transformational and development process of today's society, state and people in power. This paper has an objective of analyzing the relationship how this concept helps building the state and society.

Keywords: Asabiya, Khaldun, Society, State, transformation

ভূমিকা

আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র কোন একটি ঘটনার মাধ্যমে রাতারাতি গড়ে উঠা কোন সংগঠন নয় । বরং শত শত বছরের বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের মতবাদের ভিত্তিতে এবং সমাজ বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তর অতিক্রম করে গড়ে উঠা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সমাজ কাঠামোর অন্যতম উপাদান এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র বিবেচিত হয়ে আসছে। যেহেতু রাষ্ট্র একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে,

১ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা , উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, বিজয়নগর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া। ই-মেইল: nirupabhowmik@gmail.com

২ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা। ই-মেইল: rezapatc@gmail.com

সেহেতু সামাজিক সংগঠন হিসেবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকারী রাষ্ট্র ও তার অন্যতম উপাদান 'সংহতি' যা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ইবনে খালদুন এই সংহতিকে ও 'আসাবিয়া' বলেছেন যা 'আসাবিয়াত' নামেও পরিচিত । তাত্ত্বিক দিক থেকে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে যেসব খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অবদান রয়েছে তাঁদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। মধ্যযুগের যেসব সমাজতাত্ত্বিক তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে ইবনে খালদুন অন্যতম এবং তাঁর আসাবিয়া মতবাদ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ এক মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছে (Spittler, ২০০৮) । এ প্রবন্ধে আসাবিয়া মতবাদ কীভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রেখেছে সে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে ।

ইবনে খালদুন এবং আসাবিয়া

আরব ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন আরব দেশ ও স্পেনে বিভিন্ন পদে চাকরি করে কর্মজীবনে অতিবাহিত করেন। আইন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য এবং আগ্রহের কারণে কর্মজীবনে তার উত্থান ছিল লক্ষণীয়। ইবনে খালদুন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে গণ্য হন। বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থ 'কিতাবল ইবাবন' তাঁর মহান কীর্তি। তিন খন্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থের প্রথম খন্ড 'মুকাদ্দামা' (ভূমিকা) তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচায়ক। মুকাদ্দামায় তিনি ইতিহাস সম্পর্কিত মতবাদ বর্ণনার সাথে সমাজ কাঠামোর মূল উপাদান হিসেবে আসাবিয়াত বা সামাজিক সংগতির কথা বর্ণনা করেন। পন্ডিতরা মুকাদ্দামাকে মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক রচনা বলে গণ্য করেন এবং এরই ভিত্তিতেই সমাজ বা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)।

সংহতি বা সামাজিক সংহতির উৎপত্তি

সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু ও রাষ্ট্রীয় দর্শনের বিস্তৃতি লাভে ইবনে খালদুনের যে ধারণা বা প্রত্যয়টি সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে সেটি হল আল আসাবিয়া বা সামাজিক সংহতি। তাঁর মতে সমাজ কাঠামোর মঙ্গল উপাদান হলো সামাজিক সংহতি বা গোষ্ঠী চেতনা (Gierer, ২০০১; Wajdi dusuki, ২০০৬)। সমাজ বা রাষ্ট্রের উৎপত্তির বর্ণনা করতে গিয়ে হব্‌স্ বলেন, প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রযুক্তি ক্রিয়াশীল (Mouritz, ২০১০)। হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ তাদেরও যাবতীয় প্রাকৃতিক অধিকার তৃতীয় কোন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিমন্ডলীর হাতে নিঃশেষে সমর্পণ করে দেয়। হব্‌সের মতে এটাই হচ্ছে সামাজিক চুক্তি এবং এই চুক্তি রাষ্ট্র বা কমনওয়েলথের অন্তর্নিহিত ঐক্যের মূল উৎস। চুক্তির মাধ্যমে যে ব্যক্তির বা ব্যক্তি সংস্থার হাতে যাবতীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংস্থা হচ্ছে সার্বভৌম।

খালদুন অবশ্য হব্স্ থেকে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, সমাজের সকল মানুষ পাশবিক প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত নয়। তাঁর মতে, কিছু সংখ্যক মানুষ ঈশ্বর প্রদত্তভাবে অন্য সকল মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট। খালদুনের সমাজের অন্য সকল মানুষ যখন ঐ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে তখনই সৃষ্টি হয় আসাবিয়াত বা সংহতি। তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানুষের প্রতি মানুষের আস্থার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে উপস্থানের জন্য খালদুনের তত্ত্ব অনেক বেশি গঠনমূলক ও স্থায়ী।

আসাবিয়াত বা সংহতি বা সামাজিক সংহতি কী?

ইবনে খালদুনের আসাবিয়াতের ধারণার ভিত্তিতেই ইতিহাস সম্পর্ক ব্যাখ্যা দান এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে মতবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে আসাবিয়াতই মানব সমাজের মেলবন্ধন এবং ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি। কারণ সমাজ, রাষ্ট্র এবং সার্বভৌম ক্ষমতা মূলত আসাবিয়াতের সৃষ্টি। সংহতির ব্যাখ্যায় খালদুন বলেন যে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বাঁচার তাগিদে প্রয়োজন একটা সুষ্ঠূ পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থা তথা সমাজ ব্যবস্থা। সমাজে মানুষ তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক গঠনের কারণে একা বাস করতে পারে না। তাকে জীবনবোধ ও বেঁচে থাকার সামগ্রী সংগ্রহের জন্য পারস্পারিক সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধতা স্থাপন করতে হয় (Gaksu, ২০০৭; Wajdi dusuki, ২০০৬) । পারস্পারিক সহযোগিতার অবশ্যাম্ভাবিতাই সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি যা আসাবিয়াতেরও মূল বিষয়।

খালদুনের অভিমত হচ্ছে, মানুষকে জীবনবোধ ও বেঁচে থাকার সামগ্রী সংগ্রহের জন্য পারস্পারিক সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধভাবে বসাবাস করতে হয়। আর এভাবেই যৌথ বা সমবেত জীবনযাত্রার সূত্রপাত ঘটে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এরূপ যৌথ জীবনের সমষ্টিগত চেতনাবোধ ধাপে ধাপে সভ্যতার বা সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রমের মাধ্যমে বর্তমান সমাজের উত্তরণ। ইবনে খালদুনের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের বিষয়বস্তুই হলো এ সভ্যতা বা সংস্কৃতি। অর্থাৎ বেঁচে থাকার তাগিতেই মানুষের মাঝে সংহতির সূত্রপাত ঘটে এবং ক্রমে তা সামাজিক বন্ধনে রূপদান করে।

সংহতির উপাদানসমূহ

জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন অবলম্বনকে ভিত্তি করে বিভিন্ন রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্রতার মূলে কাজ করে গোষ্ঠী চেতনা। খালদুনের মতে গোষ্ঠী চেতনা ও সামাজিক সংহতির উন্নয়ন এবং টিকে রাখার জন্য যে উপাদানগুলো অত্যাবশ্যক সেগুলো হলো আত্মীয়তা ও রক্ত-সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পক, ধর্ম, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও শ্রম বিভাজন

(ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। এসব উপদানের মধ্যে গভীর আন্ত:সম্পর্ক রয়েছে যা মানুষ এক ঐক্যবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ প্রাণী হিসেবে একত্র করেছে। এসব উপাদান কীভাবে সামাজিক সংহতি স্থাপনে ভূমিকা রেখেছে তা আলোচনা করা হলো:

- **আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্ক**

খালদুনের মতে সমাজ সংহতি রক্তসমপর্ক, আত্মীয়তার ভিত্তিতে অথবা তৎসাদৃশ্য কোন সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল (আল-মোকাদ্দিমা, পৃ৫১, Gierer, ২০০১)। রক্ত সম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষের উপর এমনই একটা ভাবাপ্লুত মানসিক প্রভাব বিস্তার করে যে, এর ফলে দুই ব্যক্তি যারা রক্ত-আত্মীয়তাসূত্রে জড়িত পরস্পরেক সর্বান্তকরণে সাহায্য করে ও একান্ত আপন হয়ে যায়। রক্ত সম্পর্কের ফলে ব্যক্তির মধ্যে যে আত্মীয়তার বোধ জন্মে তা সমাজ ও সংহতির পাথেয় হয়ে দাড়ায় (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। রক্ত -আত্মীয়তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব সমপ্রদায় ও সমাজকে ঐকবদ্ধ করে। রক্ত-আত্মীয়তা প্রথমত ব্যক্তির প্রয়োজনে এগিয়ে আসে যা সমাজের উন্নয়নে সহযোগিতা করে।

- **বন্ধুত্ব**

সংহতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব হচ্ছে সমমনা, একই চিন্তা, ধ্যান-ধারণার মানুষের আত্মিক যোগাযোগ। একথা বলাই বাহুল্য যে, বন্ধুবান্ধব, অধীন ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে সমাজে সংহতির সৃষ্টি হয়; সমাজ আরও শক্তিশালী উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়। সমাজে সাধারণত সমবয়সী, একই রকম মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি, একই মতবাদে বিশ্বাসী, একই রকম শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে (করিম,২০০৯; Gierer, ২০০১)। সাধারণত একই রকম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে এই বন্ধুত্ব আরও মজবুত হয় এবং সমাজে সংহতি আরও দৃঢ় হয়। বন্ধুত্বের মনস্তাত্বিক নৈকট্যের কারণে সংহতির মাত্রাও তীব্রতা লাভ করে। লক্ষণীয়, যে সমাজে মানুষের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যত ভালো সে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা তত স্থিতিশীল। অর্থাৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভারসাম্য রক্ষার জন্য বন্ধুত্ব অনুষঙ্গ এক গুরুত্বপূর্ণ পালন করে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও আমরা দেখতে পাই যে যাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তারাই একে অপরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন দেশ একে অপরকে সহযোগিতা করছে; গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সংগঠন যার মূল উদ্দেশ্য দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা ও বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের উন্নয়নে অংশীদারী হওয়া।

- **ধর্ম**

একই ধর্ম দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টির নিয়ামক। একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মের বন্ধন এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও ঐক্য বা সামগ্রিক সংহতি সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। ধর্ম একটি প্রাচীন

প্রতিষ্ঠান যার মনস্তাত্বিক, সামাজিক, আর্থনীতিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসন, ধর্মীয় রীতিনীতি মানব সভ্যতার শান্তি শৃঙখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী অনুসঙ্গ। ধর্মীয় মুল্যবোধ পার্থিব লোভ-লালসার উর্ধ্বে মানুষের কল্যাণে কাজ করার এবং সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব তৈরীতে সাহায্য করে থাকে। যার ফলশ্রুতি সমাজে শান্তি সংহতি প্রতিষ্ঠা (Gierer, ২০০১)। আজকের বাস্তবতায়ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের একটি বড় বিষয় হিসেবে ধর্মকে দেখতে পাই। এর ফলেই গড়ে উঠেছে নতুন নতুন সংগঠন এবং আঞ্চলিক মোর্চা। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতার জন্য যেমন অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (ওআইসি) গড়ে উঠেছে তেমনি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দেশগুলোও তাদের ধর্মীয় নৈকট্যের কারণে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক আরও বেশি দৃঢ় করেছে। ভারতের সাথে নেপাল ও ভুটানের সম্পর্ক ভৌগোলিক অবস্থানগত দিকের পাশাপাশি ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান আরও বেশি শক্তিশালী করেছে।

- **ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী**

খালদুন বলেন যে, গোষ্ঠীর সমাজেই সমাজ সংহতিমূলক বন্ধনের আধিক্য সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। বেদুইন ও যাযাবরদের জীবনে রক্ত-আত্মীয়তা গভীরভাবে বিদ্যমান। যাযাবর জীবনে তারা পরস্পরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। তাদেরও প্রত্যেকেই একই ধরণের কঠোর, সংগ্রামশীল ও প্রাচুর্যবিহীন জীবনভঙ্গি দ্বারা লালিত হতে হয় বলে সব সময়ই তারা রক্ত আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল। মরুভূমির দারিদ্র্য যাযাবরকে আপন ভূমিতে স্থায়ী করে রাখতে পারেনি। জীবিকার তাগিদে এদেরকে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে যেতে হয়েছে। ফলে সব দেশই তাদের কাছে সমানভাবে প্রিয় হয়ে দেখা দিয়েছে (Gierer, ২০০১)। অভিন্ন জীবন-যাপনের পদ্ধতি তাদেরকে পুরুষোচিত, কর্মনিষ্ঠ এবং আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছে। শান্তি ও আরাম আয়েশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বিরাট জনগোষ্ঠীর সাথে এদের প্রায়শ যুদ্ধ বেঁধেছে। যুদ্ধে যাযাবরই জয়ী হয়েছে যা সমাজ-সংহতিকে আরও দৃঢ়তর করেছে। এই জয় তাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছে। একইভাবে হেরে যাওয়ার শিক্ষা বিজিত দলকেও আরও সংঘবদ্ধ হতে উৎসাহিত করেছে।

- **শ্রম বিভাগ**

সমাজ, সভ্যতা এবং রাষ্ট্রের উন্নতিসাধনে শ্রমবিভাগ আর্থনীতিক প্রক্রিয়াকে গতিশীলতা দানের ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী সকলের মাঝে কাজ ভাগ করে দেয়ার পদ্ধতিই শ্রম বিভাগ (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। শ্রমবিভাগ সমবেত প্রচেষ্টায় কাজ করতে বাধ্য করে এবং পরস্পরকে নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সজাগ করে তোলে।

পারস্পারিক এই নির্ভরশীলতাবোধ সংহতির জন্ম দেয়। আবার সংহতির কারণে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা আরও বেশি শক্তিশালী করে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এইসব বিষয় দ্বারা মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠে, ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে দৃঢ় করে। সংহতির মাধ্যমে গড়ে উঠা শ্রম-বিভাগের ধারণা আধুনিক রাষ্ট্র গঠনেরও হাতিয়ার। অনেক ক্ষেত্রে আসাবিয়া ন্যায়সঙ্গত আইনের চেয়ে ভাল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে কাজ করে। যার স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায় পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে।

রাষ্ট্র ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক

ইবনে খালদুন মনে করেন সমাজ ও রাষ্ট্র একই সূত্রে গাঁথা। সমাজের সাথে রাষ্ট্র, বস্তুর সাথে বস্তুর আকারের ন্যায় সম্বন্ধের ন্যায় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এই দুটিকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সমাজের বাইরে যেমন কোন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি আইন-কানুন বর্জিত, শৃঙ্খলাবিহীন কোন সমাজও টিকে থাকতে পারে না (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। আর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজন। রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা, সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সামাজিক স্থিতিশীলতা যার মুল ভিত্তি হচ্ছে সংহতি। সংহতি এমন এক আনুপাতিক অদৃশ্য সম্পর্ক যার মাধ্যমে সমাজের নানাবিধ অনুষঙ্গ একত্রিত হয়ে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, আবার রাষ্ট্রের কাঠামোকে আরও বেশি শক্তিশালী করে। একথা অনস্বীকার্য যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ সংঘবদ্ধ সমাজ প্রয়োজন যা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে এবং রাষ্ট্রের উত্তরোত্তর উন্নতিতে ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রের জন্ম

প্রাথমিক স্তরে রক্ত-সম্পর্কের সূত্রে গঠিত সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তার খালদুন আসাবিয়া ব্যবহার করেন। রাষ্ট্র সম্পর্কে খালদুনের ব্যাখ্যা যা আমরা তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ বলে ধরে নিতে পারি তবে তা তাঁর সমাজ চিন্তা হতে পৃথক কোন চিন্তা নয়। তিনি বৃহৎ সমাজের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজের রাজনেতিক কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, রাজনীতির জন্য কোন পৃথক বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রয়াসী হননি। অর্থাৎ তাঁর চিন্তা-চেতনায় মূলত সমাজ-বিনির্মাণ এবং সামাজিক সংহতির মাধ্যমে সমাজের শক্তিশালীকরণ দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর নিকট রাষ্ট্র আর সমাজ একই সুত্রে গাথা। খালদুনের মতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উদ্ভবের পেছনেও এক জাতীয় সংহতি ক্রিয়াশীল। খালদুন দেখিয়েছেন মরুভূমির যাযাবর জীবনে সার্বভৌমত্বের বীজ খুঁজে পাওয়া যাবে প্রধান নেতার মাঝে। এমতাবস্থায় ক্ষমতার উৎস হচেছ পবিত্র কোন বিষয় বা নৈতিক উপাদান । রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পেছনে সংহতি কীভাবে কাজ করে তাই তিনি বিভিন্ন উদাহরণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। উপজাতীদের দ্বারা নগর বা

শহর পদানত করার মাধ্যমেই একটি সভ্য রাষ্ট্র গড়ে উঠে। একজন নেতার বড় জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। সামাজিক স্থিতির লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে একটি বড় পরিসর যা রাষ্ট্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে।

নগর বা শহর উপজাতিদের হাতে পদানত হওয়ার কারণ হচেছ উপজাতিরা বেশি সংহত (Gaksu, ২০০৭)। যেই মুহূর্তে একটি সভ্য রাষ্ট্র গড়ে উঠলো সেই মুহূর্তে থেকে রাষ্ট্র স্বাভাবিক নিয়মে অগ্রগতি, পরিপক্কতা ও ধ্বংস এই স্তর অনুসরণ করে চলে। অন্য কোন প্রকার বাঁধা-বিপত্তি বা শক্তি বাহির হতে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক মাত্রাকে ব্যাহত করলে রাষ্ট্র অবশ্যই পাঁচটি সুনির্দিষ্ট স্তর ভুখন্ড-বিজয়-সাম্রাজ্য-গঠন-সর্বোচ্চস্তর আরোহন-শক্তিহ্রাস-পতন অনুসরণ করে চলে এবং প্রত্যেকটি স্তর নিজ স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যমান এবং রাষ্ট্রের পরিপূর্ণতার পথে ভূমিকা প্রদানকারী অনুষঙ্গ।

০১. রাষ্ট্র সত্তার ভিত্তি

প্রাথমিক স্তর রক্ত সম্পর্কের সুত্রে গঠিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে স্বাভাবিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় তাই কালান্তরে সমাজ ও রাষ্ট্রসত্তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। যুগ পরিক্রমায় সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় পরস্পরের মধ্যে নানান কারণে দ্বন্দ্ব কলহ দেখা দেয়। যে সম্প্রদায়ের অধিকতর শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ তারাই অপরাপর দুর্বল ও পরাজিত সম্প্রদায়সমূহের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজেদেরকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রবল পরাক্রমশীল যাযাবর সম্প্রদায় প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠে। প্রচুর সম্পদের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরীর আবশ্যকতা সৃষ্টি করে। তারপর তারা ধীরে ধীরে এক সময় নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসতি স্থাপন করে স্থায়ী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। নির্দিষ্ট ভূখন্ডে, বন্ধুত্বভাবাপন্ন একই রকম বড় সংখ্যক মানুষের স্থায়ী বসবাসের মাধ্যমেই এভাবে রাষ্ট্রের জন্ম নেয়। আর ক্ষমতা হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। এটি শাসন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় মাধ্যম। তবে এই ক্ষমতারও একটি সীমাবদ্ধতা আছে। একটি বিশেষ ধাপ পর্যন্ত এর যাত্রা তারপর আর অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই সীমাবদ্ধতার দরুন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি একটি নির্দিষ্ট স্থলে এসে থেমে যায়। গোষ্ঠীর শাসন-ব্যবস্থার যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অধীনে রাখতে পারে রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি ততদুর পর্যন্ত বর্ধিত থাকে।

০২. ক্ষমতার একত্রীকরণ

দ্বিতীয় স্তর হচেছ ক্ষমতা এককেন্দ্রিক করার পালা। সাধারণ সংহতির উপর নির্ভর করে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করার পর শাসকগণ ক্ষমতা একচেটিয়া করার কাজে নিয়োজিত থাকে। সাধারণ নিয়মে ক্ষমতার মোহ এবং ক্ষমতা ব্যবহারের বাসনা মানুষের চিরন্তন। এই সময় শাসকবগ

তাদেরও এই বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পায়। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের এই স্তর হচেছ ক্ষমতা গুছিয়ে আনার ও চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্তর (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২)। এ স্তরে ক্ষমতার ব্যবহার ও অপব্যহার দুটোই সমানভাবে লক্ষণীয়। ক্ষমতার আবর্তে সংহতি শব্দটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও কতিপয় ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য সংহতির পরিবর্তে বেতনভুক্ত সৈন্য ও সংগঠিত আমলা শাসকরাই প্রধান শক্তি হিসবে কাজ করে। এ সময়ে সামরিক বাহিনী, অর্থকোষ ও কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির দলই রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার প্রধান উপাদান । সমগ্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মাঝে শাসকের ক্ষমতার মোহ তৃপ্ত হয় এবং এক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াসে তার ক্ষমতা ব্যবহৃত হতে থাকে। এ পর্যায়ে ক্ষমতার ভেট গ্রহণ শুরু হয়। ক্ষমতার একত্রীকরণের স্তরে রাষ্ট্রের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় । এখানে শাসক আর শোষিত নামে দুটি শ্রেণির উদ্ভব ও উত্তরণ ঘটে।এ পর্যায় থেকেই সমাজে শ্রেণি প্রথার উদ্ভব ঘটে এবং বিস্তার লাভ করে।

০৩. বিলাসিতা ও অবসর ভোগ

ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রের বিকাশের তৃতীয় স্তর হচ্ছে বিলাসিতা ও অবসর ভোগের পর্যায় যার মূল উৎস হচ্ছে ক্ষমতা। ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিগণ তাদের আরাম-আয়েসের জন্য মনোযোগী হতে থাকে। শাসক দেশের অর্থ ব্যবস্থা সংগঠন এবং তার আয় বৃদ্ধিও দিকে মনোযোগ দেন। তিনি পূর্তকাজে এবং সভ্য রাষ্ট্রগুলোর অনুকরণে বিভিন্ন নগরের সৌন্দযবৃদ্ধির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেন। তিনি তার অনুসারীদের ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করেন এবং তারাও বিলাসময় জীবন যাপন শুরু করেন। এ স্তরে ব্যপকভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনও শুরু হয় (ইসলাম, ১৯৯১; খালদুন, ১৯৭২) । নতুন শাসকগোষ্ঠীর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কারিগরি চারুকলা ও বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে । জীবিকার স্তর থেকে বের হয়ে আসা ব্যক্তির ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে গড়ে উঠা রাষ্ট্র মানুষের অফুরন্ত সময়ের প্রসার ঘটে যা তাদেরকে নান্দনিক হতে সাহায্য করে। বিলাসিতা আর অবসর ব্যক্তিক সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ঘটাতে ভূমিকা রাখে। বিলাসিতার মোড়কে অপচয়ের বাড়াবাড়ি থাকলেও সৃষ্টিশীল কাজকে উৎসাহ প্রদান করে। মধ্য যুগ থেকে শুরু নিকট অতীতে বিভিন্ন শাসনামলে গড়ে উঠা বিভিন্ন নান্দনিক স্থাপনাগুলোই সে পরিচয় বহন করে। তবে একথা সত্য যে, ভোগ ও বিলাসিতার বিষয়টি একটি শ্রেণির কাছে সীমাবদ্ধ থাকে । রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণের এ স্তরে শ্রেণি বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। শাসক শ্রেণি আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জন করে এবং ভোগ-বিলাসিতার দিকে ঝুঁকতে থাকে। অন্যদিকে শোষিত শ্রেণি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও শাসক শ্রেণির বিলাসিতায় সহযোগিতা করার পর্যায়ে উপনীত হয়। তবে এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে শাসিত শ্রেণিও আরাম-আয়েসের মধ্যে জীবন যাপনের ফুরসৎ পায়। শাসক শ্রেণি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং একটি ছোট

দলের কাছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কুক্ষিগত হতে থাকে । ধারণা করা যায় যে, আজকের আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব এ স্তরেই।

০৪. সন্তুষ্টির যুগ

এ স্তর হচেছ সন্তুষ্টির যুগ। এ পর্যায়ে শাসক ও শাসিত সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট থাকেন। বিলাসিতা , আরাম-আয়েশ, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা তাদের এ অভ্যাসে পরিণত হয়। পূর্বের সংগ্রামী জীবনের চেয়ে এ পর্যায়ে তারা অনেক বেশি আরামপ্রিয় হয়ে উঠে। তারা তাদের পূবসুরীদেরও রক্ষিত বস্তুসম্পদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে । আবার অন্যদেক যেসব শক্তি তাদের সমৃদ্ধি ব্যহত করতে পারে সেসব শক্তি মোকাবিলায় তার সামর্থ্যহীনতার পরিচয়। সন্তুষ্টি ও বিলাসিতার কারণে তাদের মধ্যে অধিক মাত্রায় কাজ করার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে যা নিজেদেরকে দুর্বল করে। এই দুর্বলতা ক্রমশ রাষ্ট্রের অবস্থানকে দুর্বল করে এবং সামাজিক স্থিতি ও শান্তি নষ্ট করে। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র তার শক্তি হ্রাস করে ও রাষ্ট্রের বিনাশ অনিবার্য হয়ে উঠে।

০৫. রাষ্ট্রের শক্তি হ্রাস এবং বিনাশ

এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের শক্তি হ্রাস ও সংহতি বিনাশ প্রক্রিয়া শুরু হয়। অমিতব্যয় ও অপচয়ের পঞ্চম ও সর্বশেষ পর্যায়ের সূচনা হয়। এ পর্যায়েই শাসক তার লোভ লালসা ও সুখ আনন্দের স্বার্থে পূর্ব পুরুষদের সঞ্চয় বিনষ্ট করেন। অধিকন্তু তারা তাদের সৈন্যদের অংশবিশেষ হারান, কারণ তারা তাদের পারিশ্রমিকের অর্থ তাদের ব্যক্তিগত সুখ-আনন্দের জন্য ব্যয় করেন। শাসক শ্রেণির অমিতব্যয়িতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক ভোগবাদিতার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় সংকুচিত হয়। এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের রাজধানীতে ভাড়াটে সৈন্য এবং বেসামরিক আমলারা শাসকের কাজ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেন এবং তিনি নামমাত্র শাসকই থাকেন । শাসক শ্রেণির ভুল ও অপরিণামদর্শিতার কারণে সামরিক ও বেসামরিক আমলারা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং বাইরের শক্তিশালী দল রাষ্ট্র দখলের সুযোগ নেয়। শেষ পর্যন্ত বাইরের আক্রমণকারী রাষ্ট্রের জীবনাবসান ঘটায় বা তৈলশুন্য প্রদীপের নিবন্ত সলতের মত বিলুপ্ত না যাওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের পতন ঘটতে থাকে। দৃশ্যত রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণির অবচয়, ভোগ-বাদিতার জন্যই রাষ্ট্রের বিনাশ অনিবার্য হয়ে উঠে।

খালদুনের এই চক্রাকার ব্যখ্যা পরবর্তীকালে বহু সমাজতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবেত্তাকে প্রভাবিত করেছে বললে ভুল হবে না। কেননা পরবর্তীকালে বহু ইতিহাসবেত্তা ও সমাজতত্ত্ববিদ সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরিবর্তনকে চক্রাকারে ঘুরতে দেখেছেন।

Oswald Spengler এর The Decline of the West গ্রন্থে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। টয়েনবির ইতিহাস দর্শন এবং তাঁর সভ্যতার ইতিহাস লেখায় এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। সংস্কৃতির রূপান্তর, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, কার্যকারিতা ও পরবর্তী সময়ে ধ্বংস ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎপত্তি অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের মাঝে একটি দার্শনিক রীতি প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা খালদুন করেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আধুনিক সমাজ এবং আসাবিয়া

ইবনে খালদুনের আসাবিয়া মতবাদ আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এক শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। আসাবিয়ার মুল উপাদান হচেছ আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, শ্রম বিভাজন। এই সব উপদান আধুনিক সমাজ গঠন, বৃদ্ধি, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো সর্বপোরি সমাজে শান্তি-শৃঙখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আত্মীয়তা এবং রক্ত সম্পর্ক সমাজে সামাজিক ক্ষমতায়নের একটি প্রধান অনুষঙ্গ। একটি গ্রাম বা পাড়ার নিজস্ব আত্মীয় স্বজন যত বেশি তাদের মধ্যকার সম্পর্ক তত বেশি ঘনিষ্ঠ (Bukhari, ২০১০; Haller, 2009; সেন Ges bv_, 2005)। যদিও আধুনিক সমাজের নেতিবাচক কিছু দিক বা ক্ষমতার অংশীদারিত্বের জন্য আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মারামারি হানাহানি একেবারে কম নয়। তবে মানসিক নৈকট্য বা মানবিক দুর্বলতার জন্য রক্ত সম্পর্ক এবং আত্মীয়তা একটি সংঘবদ্ধ সমাজ গঠনে অনস্বীকার্য। সমাজে লক্ষণীয় যে, যে পরিবার জনবল এবং শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে তারাই সমাজের মূল ক্ষমতা ভোগ করে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। একইভাবে ধর্ম একটি প্রাচীন সংঘঠন এবং এর ভিত্তিতেই আধুনিক সমাজ গড়ে উঠেছে (Haller, ২০০৯)। ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান একটি সমাজের সীমানা নির্ধারণ করে। এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। একটি ধর্ম সেই সমাজের রীতিনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, এমনকি রাষ্ট্রেরও। আপাতদৃষ্টিতে সমাজের বিভাজন মনে হলেও ধর্ম একটি গোষ্ঠীকে একত্রে শান্তিপূর্ণ বসবাসের অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে। তবে এটা শহুরে সমাজকে খুব একটা প্রভাবিত করে না। রক্ত-সম্পর্ক, আত্মীয়তা ও ধর্ম একটি বড়দলকে সংঘবদ্ধ করে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে । এ তিনের সম্মিলন সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে যা একটি মূল শ্রোতধারা তৈরি করে। তবে একটি সমাজে মুল স্রোতধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে অনেক বেশি সংগ্রাম করতে হয়। মূল স্রোতের রীতি নীতি যেহেতু বৃহত্তর সমাজের স্বাভাবিক রীতিনীতিতে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব রীতিনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজেদেরকে আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে এবং আন্ত-সম্পর্ক আরও বেশি কার্যকর ভুমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, পাকিস্তানের আফ্রিদি জনগোষ্ঠী, অষ্ট্রেলিয়ার

আদিবাসীদের মধ্যে সংহতি প্রবল। বসবাসের ক্ষেত্রে তারা তাদের জন্য আলাদা ভৌগোলিক অবস্থান বেছে নিয়েছে (করিম, ২০০৯)।

সমাজ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর চেতনা ও ঐক্যের বন্ধন। বেঁচে থাকার জন্য একে অপরকে যেমন সহযোগিতা করছে তেমনি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই নির্ভরশীলতা একে অপরকে আরও বেশি কাছে টেনেছে; একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের মাঝে সংহতি দৃঢ়তর হয়েছে। আসাবিয়া মতবাদটি মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এর গুরুত্ব ও পরিধি বেড়েছে। আধুনিক সমাজ আরও বেশি একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রতিটি একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া কল্পনা করতে পারে না। বিশ্বায়নের যুগে গতিশীলতা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতাই সমাজে সংহতিকে আরও দৃঢ় করেছে (সেন, ২০০৫)। সমাজের গন্ডি পেরিয়ে এ সংহতি আরও ব্যাপক রূপ নিয়েছে।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য সমাজে বসবাস করছে এবং প্রয়োজনগুলো সবাই মিলে মেটানোর চেষ্টা করছে। মাজলোর চাহিদা তত্ত্ব অনুসারে প্রাথমিকভাবে মানুষ তাদের প্রথম স্তরের চাহিদাগুলোর পর অন্য চাহিদাগুলো পুরণের জন্য একে অপরের প্রতি মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন মানুষকে আরো বেশি মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। চতুর্থ স্তরের চাহিদাগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে সংহতি মতবাদ অনেক বেশি কার্যকর। এ সংহতির কারণে একত্রে শান্তিপুর্ণভাবে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। মানুষের মাঝের সুকুমার বৃত্তির চর্চা বেড়েছে; বেড়েছে মনুষ্যত্ববোধ। এ সংহতির কারণে সমাজে মানুষ তাদের প্রযোজনে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমনকি সংহতির প্রভাব আধুনিক রাষ্ট্রের শহুরে সমাজ ব্যবস্থায়ও পড়েছে। আসাবিয়ার মূল-চালিকা শক্তি তথা আত্মীয়তা, ধর্ম পরিচয় সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে ভূমিকা রাখছে যার প্রতিফলন দেখতে শহুরে সমাজে বসবাসের নিমিত্ত আবাসিক বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে। ধমীয় মিল, চাকরিসূত্রে এক প্রকার আত্মীয়তা ভিন্ন ভিন্ন জেলার মানুষ হওয়া সত্বেও অনেকে মিলে একত্রে বসবাস করার লক্ষ্যে আবাসিক প্লট বা অ্যাপার্টমেন্ট তৈরী করছে। এ যেন এক নতুন বর্ধিত আত্মীয়তার বন্ধন যার মূলে রয়েছে সংহতি (করিম, ২০২০এ, ২০২০বি)।

আধুনিক রাষ্ট্র এবং আসাবিয়া

ইবনে খালদুনের রাষ্ট্র সম্পর্কীয় মতবাদ মধ্যযুগের অনেকাংশে সত্যি যখন ক্ষমতা কেবল একটি শ্রেণির কাছে কুক্ষিগত ছিল। শাসকের শক্তি প্রদর্শন এবং শক্তির মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার যখন রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়মের অংশ ছিল তখন পাঁচ স্তর বিশিষ্ট মতবাদটি অনেক বেশি সর্বজনীন

ছিল। তবে সময়ের সাথে ক্ষমতা যখন একটি গোষ্ঠীর বাইরের জনগণের হাতে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তখন বুদ্ধিভিত্তিক বিষয় এবং জনগণকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ধারণা করা হচেছ। ক্ষমতার পরিবর্তনশীল চক্র মধ্যযুগে যেভাবে আবর্তিত হয়েছে তারই মাধ্যমে ক্ষমতার সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রসমন্ধীয় মতবাদটি থেকেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার শাসকগণ শিক্ষাগ্রহণ করেছে (সেন, ২০০৫)। যে সব শাসক এ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের ক্ষেত্রে ধ্বংস অনিবার্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার যে দার্শনিক রূপটি মধ্যযুগে ছিল তার বহিঃপ্রকাশ বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও রয়েছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে গণতন্ত্র এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। যেসব দেশে এখন শাসকশ্রেণি তাদের ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার জন্য নিজেদেরকে অপরিহার্য মনে করে এবং প্রতিপক্ষকে রাষ্ট্রক্ষমতার অযোগ্য মনে করে। এ সুযোগে সামরিক ও বেসামরিক হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়।এসব উন্নয়নশীল দেশে এখনও স্থিতিশীল সরকার গঠন সম্ভব হয়ে উঠেনা। কিন্তু এসব সীমাবদ্ধতার মাঝে যখন কোন সরকার মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কাজ করে তখন সাধারণ মানুষ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে মেনে নেয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এটি একটি সম্বলিত সংহতির বহিঃপ্রকাশ যা আধুনিক রাষ্ট্রকে একদিকে উন্নত জাতিরাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে অন্যদিকে রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ইবনে খালদুনের আসাবিয়া মতবাদটির ভিত্তিতেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্তিতিশীলতা এবং সংহতির মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

রাষ্ট্রের মূল উপাদান নির্দিষ্ট ভুখন্ড, জনসংখ্যা, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব যার মধ্যে সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন। আধুনিক রাষ্ট্র ধারণায় এই সাবভৌমত্বই সামাজিক সংহতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কেননা রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল জনগণ রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতাকে যখন মেনে নেয় তা সমাজের সংহতির বহিঃপ্রকাশ বলে লক্ষ করা যায়।

যেহেতু সমাজ ছাড়া কোন রাষ্ট্র কল্পনা যায় না, সমাজের সকল অনুষঙ্গ এবং বিষয়াদি রাষ্ট্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে (উদ্দিন, ১৯৮৬; ওয়াদুদ, ১৯৫৫)। যেখানে সামাজিক সংহতি যতবেশি সুদৃঢ় সে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙখলা, রাষ্ট্রীয় উন্নতি লক্ষণীয়ভাবে স্থিতিশীল। এই স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, আত্মীয়তার বন্ধন, ধর্ম, জাতি বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সমপদের আদান প্রদান ইত্যাদি বিষয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর এসব সামাজিক প্রভাবশালী আনুষঙ্গ সামাজিক সংহিতর উপাদান হিসেবে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

খালদুনের রাষ্ট্র সম্পর্কীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, রাষ্ট্র যখনই প্রতিষ্ঠিত

হয় তখনই একজন শাসকের প্রয়োজন হয় এবং এই শাসকের নিকট সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রশ্নাতীত কর্তৃত্বের প্রতি সবাই মৌন সম্মতি ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে একদিকে যেমন সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয় অপরদিকে সংহতির অগ্রগতিও লক্ষ করে।

উপসংহার

সামাজিক সংহতি হচ্ছে মানুষের শান্তিপুর্ণভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানো, সহমর্মিতা দেখানো, প্রয়োজনীয় সম্পদের আদান-প্রদান সর্বোপরি সংঘবদ্ধভাবে বসবাসের মাধ্যমে সমস্যাবলীকে একত্রে মোকাবিলা করে সমাজে শান্তি শৃঙখলা বজায় রাখা। সামাজিক সংহতি মতবাদটি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এক গুরুত্বপুর্ণ এবং অপরিহার্য অনুষঙ্গ । এ মতবাদের উপর ভিত্তি করে মধ্যযুগে রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং পরবর্তীতে পূর্ণতা লাভ করে।

তথ্য নির্দেশিকা

1. ইসলাম, ড. আমিনুল (১৯৯১), মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, বাংলা বাজার, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

2. খালদুন, ইবনে (১৯৭২), আল-মুকাদ্দিমা (অনূদিত- নুর মোহাম্মদ মিয়া), ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

3. Bukhari ,S.M.M. H. (2010) The Incoherence of Islamic Social Sciences: Some Lessons from Imam Ibn-i-Khaldoon, Pakistan Business Review July 2010

4. Gierer, A. (2001) Ibn Khaldun on Solidarity ("Asabiyah") - Modern Science on Cooperativeness and Empathy: a Comparison, Electronic version of the article in: Philosophia Naturalis 38, pp. 91-104 (2001).

5. করিম, মোহাম্মদ রেজাউল (২০০৯), 'Ethnic and Racial Inequality in Employment in United Kingdom: Reality and Reasons' Bangladesh Jounral of Public Administration, Vol-18, No. 2, pp. 43-63.

6. করিম, মোহাম্মদ রেজাউল (২০২০এ), Unplanned Housing in Bangladesh: The Problem with Housing Societies, https://www.urbanet.info/unplanned-

housing-in-bangladesh

7. করিম, মোহাম্মদ রেজাউল (২০২০বি), 'Life in the time of coronavirus in Bangladesh and elsewhere', https://southasiamonitor.org/index.php/open-forum/life-time-coronavirus-bangladesh-andelsewhere

8. উদ্দিন, মুহাম্মদ আয়েশ (১৯৮৬), রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি, ঢাকা: দি স্ট্রার প্রেস।

9. ওয়াদুদ, আবদুর (১৯৫৫), মুসলিম মনীষা, কলকাতা।

10. সেন, ড. রঙ্গলাল এবং নাথ, বিশ্বম্ভর কুমার (২০০৫), প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা: নিউ এজ পাবরিকেশন্স।

11. Gaksu, A. (2007) Ideals and Realities: Ibn Khaldun's Justification of Asabiyya and Political Power felsefe dinyasi, 2007/2, sayi 46

12. Haller, A. O. (2009) Empirical Stratification Theory: Ibn Khaldun (1377) to Today, Population Review, Volume 48, Number 2, 2009, p. (Article), Published by Population Review Publications, DOI: 10.1353/prv.0.0019

13. Martin, D. (1970), The Nature and Types of Sociologyal Thought, London: Routhledge and Kegah Paul

14. Mouritz, T., 2010. Comparing the social contracts of Hobbes and Locke. The Western Australian Jurist, 1(1), pp.123-127.

15.Spengler, O., 1991. The decline of the West. Oxford University Press, USA.

16. Spittler, G. (2008) Work and Needs as Basis of Civilization: Ibn Khaldûn's Muqaddima in Comparison(This is an expanded and modified version of a paper I wrote for the conference on "Ibn Khaldûn – Contemporary Readings" plannned by AUB and Orient-Institut to take place in Beirut on 9-10 May 2008, which had to be cancelled due to the political situation) (www.//scholar.google.com)

17. Wajdi dusuki, A (2006) Empowering Islamic Microfinance: Lesson from Group-Based Lending Scheme and Ibn Khaldun's Concept of 'Asabiyah, Paper presented at Monash University 4th International Islamic Banking and Finance Conference. Kuala Lumpur on 13-14 November.